শম্ভু মিত্রের মৌলিক নাটক

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

"প্রতিভা যাহা কিছুকে স্পর্শ করে তাহাকেই সোনা করিয়া তোলে"। -- শ্রী শম্ভু মিত্রের বহুমুখী সৃষ্টিশীল জীবন এই প্রতিভার দ্যুতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। তিনি যে কেবল নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারতীয় আধুনিক থিয়েটারের জন্ম ও তার শ্রেষ্ঠতম রূপ নির্মাণ করেছিলেন তা-ই নয়,-চলচ্চিত্র, আবৃত্তি ও সাহিত্যকর্মেও তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। নাট্য নির্দেশনার পাশাপাশি নাটক রচনাতেও তিনি অসামান্যতার পরিচয় রেখেছেন। নাট্যরূপ, অনুবাদ, রূপান্তর এবং মৌলিক—নাটক নির্মাণের এই বিচিত্র প্রবাহ তিনি অবগাহন করেছেন। তাঁর মৌলিক নাটক 'চাঁদ বনিকের পালা' এ যুগের এক পরম সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের পর এমন স্মরণীয় বাংলা নাটকের অন্য দৃষ্টান্ত মেলে না। নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও তিই তিনি অদ্বিতীয়।

মৌলিক নাটক রচনার প্রবল শক্তি থাকা সত্ত্বেও শম্ভু মিত্র নাট্যকার হিসেবে নিজের নামকে আদ্যন্ত আড়ালে রাখতে চেয়েছেন। শম্ভু মিত্র নাটক লিখেছেন বিভিন্ন ছদ্মনামে। কিন্তু নির্দেশনায় তিনি স্বনামেই প্রকাশিত ছিলেন। কেন এই ছদ্মনামের আড়াল ? হয়ত নাট্যনির্দেশনার কাজকেউ তিনি তাঁর আত্মপরিচয়ের যথার্থ ক্ষেত্র মনে করতেন বলেই এমটি হয়েছিল। এই মানসিকতা থেকেই 'শ্রীসঞ্জীব' এই ছদ্মনামে চল্লিশের দশকের শুরুর দিকে (১৯৪২-৪৩) তিনি তাঁর প্রথম নাটক 'উলুখাগড়া' লেখেন। তখনকার 'পাবলিক থিয়েটারে' অভিনীত নাটক গুলির থেকে 'উলুখাগড়' বিষয় ও বিন্যাসে ছিল স্বতন্ত্র। চল্লিশের দশকের শুরুতে কলকাতায় অন্য ধরনের নাটক লেখার সূত্রপাত হচ্ছিল। তখনকার নব্য দৃষ্টিভঙ্গী উলুখাগড়ার মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তখন শিশির-যুগের অবসান ঘটেছে, পাবলিক থিয়েটারে চলেছে অবক্ষয়। দেশ—কালের মধ্যে তখনকার ঘনায়মান আবর্ত পাবলিক

থিয়েটারের নাট কে প্রতিফলিত হচ্ছে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বমন্তর, রাজনৈতিক আন্দোলনে তখন দেশে কম্পমান——জার্মানী, ইটালী, জাপান ও স্পেনে ফ্যাসিজমের উগ্রমূর্তি জাগিয়ে তুলছে বিশ্বত্রাস। এদেশে এবং বিদেশে এসবের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের প্রানে নতুন চেতনার বিস্তার ঘটছিল। এখানে একদিকে যেমন ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তীব্র হচ্ছিল অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাম্যভাব অনুপ্রাণিত মানবিক বোধ মানুষের মধ্যে তীব্রতা পেতে শুরু করেছিল। চল্লিশ দশকের শুরুর দিকে এই চেতনা পাবলিক থিয়েটারে উচ্চারণ পায়নি কিন্তু বাংলা নাটক অন্য পথে এই চেতনাকে রূপায়িত করতে শুরু করে ছিল। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ এবং তার নাট্যবিভাগ গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে এই বিশিষ্ট চেতনা ও আদর্শ সম্পন্ন নাটক রচনায় উৎসাহ দেখা দিল। এই সচেতন নাট্যধারায় এল নতুন চরিত্রের নাটক--'অঞ্জনগড়', 'কেরানী', 'ল্যাবোরেটারী', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', ইত্যাদি। এই বোধ ও পরিমন্ডলের মধ্যে থেকেই শম্ভু মিত্রের প্রথম নাটক 'উলুখাগড়া' রচিত হয়। ১৯৫০ সালে বহুরূপীর প্রথম নাট্যোৎসবে 'উলুখাগড়া' 'পথিক' ও ছেঁড়াতারের' সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। উলুখাগড়া নাটেকের শেষাংশ তার মঞ্চরূপে কিছুটা বদল হয়েছিল।

উলুখাগড়া'র বিষয়-ভাবনা সম্পর্কে 'বহুরূপীর বক্তব্য : "একজন লোক যিনি এককালে খদ্দরের পলিটিক্স করতেন কিন্তু যাঁর লক্ষ্য ছিল গদী এবং সেই গদী আহরণের জন্য যিনি প্রেমের ধাপ্পা দিয়ে বিয়ে করেছিলেন একটি সরল মেয়েকে (যাকে তিনি 'সাধারন মানুষ বলে উল্লেখ করে থাকেন)। সেই ভূত পূর্ব সত্যাগ্রহী গদী আরূঢ় কর্তার বাড়ির সন্তান দুই ধরনের ঃ এক (ছেলেটি) সিনিক, ঠাট্টাবাজ, বর্তমানে কাঠামোর সমালোচক কিন্তু প্রতিপক্ষ নয়। আর দ্বিতীয় (মেয়েটি), যে জানে যে সে নিজে বিরূদ্ধাচরণের শক্তি রাখে না, তার আশ্রয় চাই অন্য শক্তির হাতের মধ্যে। এ তো গেল তাদের নিজেদের সমস্যা। কিন্তু তাদের মা। যে একদিন সরল বিশ্বাসে ভেবেছিল তাকে উদ্ধার করবে তার স্বামী, সেই স্বামীর হাতে থেকে তাকে, সেই 'সাধারন লোককে উদ্ধার করবে কে? 'উলখাগড়া'র মধ্যে উদ্ধৃত বক্তব্যটি যথার্থই ব্যক্ত হয়েছে। ' সাধারন মানুষ'কে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লিবার‍্যাল ডেমোক্রসীর ধ্বজাধারী একশ্রণীর মানুষ যে প্রকৃতপক্ষে ঐ 'সাধারন মানুষদে'র উপর কর্তৃত্বের ডিক্টেটরী চালায় তার একটি বাস্তব, দৃষ্টান্ত এ-নাটকের দেবব্রত চরিত্রটি। এবং সাধারন মানুষের মর্মান্তিক অসহায় রূপটি প্রকাশ পেয়েছে দেবব্রত-র স্ত্রী করুণার ট্র্যাজিক পরিণতিতে। শম্ভু মিত্র রচিত এই নাটক সামাজিকবোধ যতটা জীবন্ত নাট্য- কলার শক্তি ও সৌন্দর্যে ততটা সুঠাম নয়।

এবপর ১৯৪৪-১৯৪৫ ত্র তিনি তাঁর দ্বিতীয় নাটক "একটি দৃশ্য" নাটকটির রচনায় হাত দেন। নাটকটি অসম্পূর্ণ। শম্ভু মিত্রের ভাবনায় নাটকটি সম্পূর্ণ হতে আরও দুটি দৃশ্যের প্রয়োজন ছিল। তবে এই নাটকটির অসম্পূর্ণ রূপের মধ্যে এক ধরণের একটা সম্পূর্ণতা

ছিল। একাঙ্ক নাটক হিসেবে 'একটি দৃশ্য' উপস্থাপনার সুযোগ থাকায় গননাট্য সংঘ থেকে ১৯৪৫ সালের ১৭ডিসেম্বর মিনাভায় গঙ্গাপদ বসুর নির্দেশনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং খ্যাতিও অর্জন করে। এ নাটকের মধ্যেও সমাজের পাপ ও ব্যাধির প্রকাশ। তবে ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে এ-নাটকের প্রধান চরিত্র নগেন কিন্তু বলে "আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবী থেকে সমস্ত কিছু ভাল এখনও ধুয়ে মুছে যায়নি। অন্তত এই বিশ্বাস নিয়েই আমি চেষ্টা করব ভাল করে বাঁচার। আমি সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার করে ফেলব--তার ওপর নিঃশেষ হয়ে নতুন সংসার গড়ব। বাঁচতে না পারি , অন্তত, বাঁচার চেষ্টা করে মরব।"

শম্ভু মিত্রের 'ঘূর্ণি' নাটকটিও মঞ্চস্থ হয়নি। নাটকটি সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত হয়েছে একটি 'লিটল ম্যাগাজিনে'--ধারাবাহিক ভাবে। পরে ১৯৬৫ সালের ২৩ সংখ্যা বহু রূপীতে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ সালে। এ নাটকেও সমাজের গ্লানি মানুষ্যত্বের অবমাননা এবং হতাশা এক অন্ধ কারের ঘনায়মান পরিবেশ জাগিয়ে তোলে। তবে এ-নাটকের মুখ্য চরিত্র বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতির নানা জিঙ্গাসা ও বিচার প্রকট হয়ে ওঠে। আগের দুটি নাট কে রাজনীতির এই প্রাধান্য ছিল না। রাজনীতির ব্যাক্তি ও সংস্থায় অবস্থান সম্পর্কেও এ নাটকে প্রশ্ন ওঠে। সব কিছু ভেঙে যাবার পরিস্থিতির সূচনা দেখা দিলেও পুনর্গঠনের দায়িত্ব যে থেকে যায়--তার প্রগতিবাদী উপসংহার ঘূর্ণিতেও রয়েছে । নাটকটি গঠনে চরিত্রে এবং বুদ্ধিদীপ্ত তীব্র সংলাপ গুনে আগের নাটক দুটির চেয়ে অনেক পরিণত।

এরপর ১৯৫১ সালে শম্ভু মিত্র লেখেন 'বিভাব'। অবশ্য বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিভাগ' নাট কের শেষে একটি নিবেদনে বলা হয়েছে--"এ না টিকার কোনও লেখক নেই। একজনের সামান্য একটা আইডিয়া বিস্তার করে অভিনেতৃবর্গ নিজের নিজের কথা প্রায় নিজে নিজে বানিয়েছেন।"তাই বলা যেতে পারে মুখ্য নির্মাতা শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে'বিভাব' একটি 'গড়ে-ওঠা' নাটকের সমবেত প্রয়াস। খুবই স্বল্প দৈর্ঘের এ-নাটক। নাটকটি ভাবনার দিক থেকে চমৎকার তবে এর সুখ্যাতি নিদারুনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল পরীক্ষামূলক প্রয়োগের আশ্চর্য অভিনবত্বে। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র এবং জাপানের 'কাবুকি' থিয়েটারের নাট্যরীতি থেকে কিছু উপাদান 'বিভাবের' প্রয়োগ কর্মে ব্যবহার করা হয়েছিল। এ-নাটকটি যে সাইম ধর্মী অভিনয় উপস্থাপন করেছিল তা সে সময় একেবারে অকল্পনীয় ছিল। বিষয়ের দিক থেকেই নাটকটি নতুনত্ব দাবী করতে পারে। সর্দার প্যাটেল গাল দিয়ে বলেছিলেন, 'বাঙালি হাস তে ভুলে গিয়েছে'। তাই উত্তজিতভাবে শম্ভুদা, অমরবাবু এবং বৌদি (তৃপ্তি মিত্র) ভাবতে বসলেন, সত্যিই কি বাঙালি হাসতে ভুলে গেছে এমন নাটক কি করা যায় না যা দেখে সবাই হো-হো করে হাসবে? কেমন হবে তার কাহিনী? নানা জল্পনার শেষে অমর বাবু আর শম্ভুদা বেরিয়ে

পড়লেন রাস্তায়, হাসির খোঁজে। পথে পথে নানা অভিজ্ঞতা। শেষে খাদ্য আর বস্তের দাবিতে তাদের সামনে এল একটা মিছিল। পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়া এক রমণী। রমণীর গলা থেকে তিনবার উচ্চারিত হল মরণোন্মুখ একটি শব্দ — পশু পশু পশু। নিরাপদ আড়াল থেকে শম্ভুদা বেরিয়ে এসে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললেন—বাঙালি এবার বোধহয় হাসবে। এইভাবে 'বিভাবে' এক অতর্কিত চাবুকের আঘাত এসে পড়ত রাষ্ট্র ও সমাজের উপর। বিভাগ নাটক এবং আলো, মঞ্চসজ্জা, উপকরণহীন এ নাটকের প্রয়োগ বাংলা নাট্যের ইতিহাসের এক বিরল বিস্ময়।

অমিত মৈত্র-র সঙ্গে শম্ভু মিত্র যুগ্মভাবে রচনা করেন 'কাঞ্চনরঙ্গ' (১৯৬১)। শহরের সওদাগরী সমাজে গেঁয়ো সরল সহজ লোক পাঁচু কিভাবে অর্থের লোভ-লালসার জালে জড়িয়ে পড়ে এবং তার থেকে উদ্ধার পায় তারই কাহিনী 'কাঞ্চনরঙ্গ'। অফুরন্ত কৌতুকের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে নাটকটি অর্থ-লোলুপ সমাজের প্রতি তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করে। বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল 'কাঞ্চনরঙ্গ'। কাহিনীটি সম্পর্কে 'বহুরূপী'র তরফে বলা হয়েছিল—"কাহিনীটি আধুনিক কিন্তু জাতে রূপকথা। হাতিশালের হাতি নয়, ঘোড়াশালের ঘোড়া নয়,পত্রপাত্রীরা প্রায় সবাই টাঁকশালের জীবের পিঠে চাপতে চায় এখানে—এহেন সওদাগরী সমাজের রাজপুত্তুর থেকে ব্যাঙ আবার ব্যাঙ থেকে রাজপুত্তুর হওয়ার মত এক সাধারন মানুষের মানুষিকতা হারিয়ে ফের ফিরে পাওয়ার এ গল্পের শেষ। শম্ভু মিত্র গর্ভবতী বর্তমান (রচনা— ১৯৬৩) এবং 'অতুলনীয় সম্বাদ' (রচনা—১৯৬৫) নামে দুটি একাঙ্কিকা লেখেন সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে। গ্রন্থভুক্তিকালে (বৈশাখ ১৪০০)এদের তিনি চিহ্নিত করেছেন 'কৃষকৌতুকীয় নাটিকা' বলে। কৃষকৌতুকীয় নাটিকা বলতে এদের ব্ল্যাক কমেডি বলা হয়েছে সন্দেহ নেই। ব্ল্যাক কমিডির মধ্যে কমিডির বৈশিষ্ট আপাতভাবে বজায় রেখে ভিতরে ভিতরে সমাজ ও জীবনের গূঢ়, গম্ভীর বিকট এক কৃষচ্ছায়ার আভাস সঞ্চারিত রাখা হয়। ফলে কমেডির কৌতুকময় সুখকর রূপের মধ্যে জটিলতাপূর্ণ এক অশুভ-সংকেত উঁকি দেয়। 'গর্ভবতী বর্তমান' এবং 'অতুলনীয় সম্বাদ' নাটিকা দুটির মধ্যে ব্ল্যাক কমেডি বা কৃষকৌয় নাটকের এই বৈশিষ্ট বর্তমান 'গর্ভবতী বর্তমানে' মধ্যবিত্ত মানুষের সুখসন্ধানের বিপন্ন অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক ডামাডোলের পটভূমিতে। 'অতুলনীয় সম্বাদে' প্রেম-বিবাহ-সংসার-সন্ততি প্রবাহিত জীবনে দুর্নীতি ও অনাচারকে চেপে রেখে বহিরঙ্গে নীতির মহিমা কীর্তনের এক হাস্যকার প্রয়াস।

চাঁদ বনিকের পালা (রচনার শুরু ঃ ১৯৬৫) ছাপা শুরু হয়েছিল 'বটুক' ছদ্মনামে। ধারাবাহিকভাবে ফেব্রয়ারি ১৯৬৬-র বহু রূপীর ২৪ সংখ্যা থেকে 'চাঁদবনিণকের পালা'প্রকাশিত হতে থাকে। এ নাটকটি শম্ভু মিত্রের এক স্মরনী কার্তি এবং আমাদের নাট্যসংসারের এক

বিশাল সম্পদ। এ নাটকীয় যিনি পাঠ করেছেন বা শম্ভু মিত্রের পাঠ শুনেছেন তিনি জানেন লিখে বা আলোচনা করে নাটকটির মহাত্ম্য বোঝানো কত কঠিন-- এ নাটকের সঙ্গে পাঠকের ব্যক্তিগত সংযোগ-ই কেবল নাটকটিকে উপলব্ধির সঠিক পথ। মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদসদাগরের কাহিনীকে আশ্রয় করে এ-নাট কের মধ্য দিয়ে শম্ভু মিত্র প্রকাশ করেছেন আধুনিক কালের কিংবা সর্বকালের এক মহাকাব্য। মূল কাহিনীর মধ্যে ভাঙচুর ঘটিয়ে দেশ-কাল সম্পর্কে নিজেস্ব অভিগতা, দর্শন, উপলব্ধি ও অনুভবের এক গভীরতম কাহিনী তিনি আমাদের শুনিয়েছেন 'চাঁদবণিকের পালায়।' জীবনের , সমাজের অনিবার্য, অমোঘ কত প্রশ্ন, কত রকম উপলব্ধি, কত রহস্যের সংবাদ যে এ নাটকে রয়েছে। নীতিহীনতার বিরুদ্ধে, অজ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিরুদ্ধে 'চাঁদবণিকের পালা' এক সুগভীর প্রতিবাদ। নাটকের শুরু চাঁদবনিকের অভিযানের প্রস্তুতি দিয়ে, তারপর যাত্রা যাত্রা সাগরে, সাগরের দূরন্ত ঝড়ের মধ্যে, প্রচন্ডতম বিরুদ্ধতার মধ্যে এই পাড়ি দেবার বিফলতাও যেন বিফলতা নয পরাজয়ও পরাজয় নয় কারন চরম দুর্যোগ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে মানুষের অভিযাত্রী অন্তর তো থেমে যেতে পারে না--তাহলে তো থেমে যাবে জীবনের প্রবহমানতার শক্তি, তাহলে তো স্তব্ধ হয়ে যাবে জীবনের মহত্তম রূপের আবিস্কারের ইতিহাস। তাই এ নাটক সব হারিয়েও বলতে চায়- 'আমরা ক'জনা প্রেতের মতো চিরকাল পাড়ি দিয়্যা যাব। আমাদের কেউ নাই, কিছু নাই। কতো বাঁও জল দেখ। তল নাই? পাড়ি দেও '' 'চাঁদবণিকের পালা' আমাদের সমকালের 'ওডেসি'। বিষয়ে গঠনে এ-এক মহাবিস্ময়।